চরিত্র আলোচনা

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর' সেই চরিত্র, যার নামে উপন্যাসের নামকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও বিচারে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের আদর্শ চরিত্র চন্দ্রশেখর। সম্ভবত সেই কারণেই বঙ্কিম কেন্দ্রিয় চরিত্র শৈবলিনী বা রোমান্টিক নায়ক চরিত্র প্রতাপের নামে উপন্যাসের নাকরণ করেননি। চন্দ্রশেখর উদার, মহৎ, শাস্ত্রজ্ঞানী, ধীর-স্থির পুরষ। পরিবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' প্রভৃতি গ্রন্থে যে নিষ্কাম কর্মসাধনার আদর্শ-প্রকাশ করেছেন, চন্দ্রশেখরের চরিত্র পরিকল্পনায় তারই প্রথম উপস্থাপনা। শৈবলিনী কিংবা প্রতাপের মত কর্মচাঞ্চল্য হৃদয় তরঙ্গোচ্ছ্বাসের পরিচয় চন্দ্রশেখরের মধ্যে অনুপস্থিত। তবুও এই নম্র-নীরব-অচঞ্চল মানুষটির যে সৌন্দর্যমন্ডিত সে বিষয়ে সংশয় নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে চন্দ্রশেখরের জন্ম ; আপন স্বভাব ধর্মে জ্ঞানতপস্যা ব্রতী জ্ঞান সমুদ্রের সম্পদ অর্জনে একান্ত মগ্ন— এই কারণেই বয়স অতিক্রান্ত হলেও বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি অনেকদিন পর্যন্ত। সংসার বিমুখ ছিল তার মন। শৈবলিনী বা প্রতাপের মতো এই নম্র নীরব মানুষটি পাঠকের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ না করলেও চন্দ্রশেখর চরিত্রের শিল্পগত সৌন্দর্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। চন্দ্রশেখরের প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতিও প্রবল।

শাস্ত্রানুশীলনরত, প্রায়-অতিক্রান্ত-যৌবন এই মানুষটি একসময় শৈবলিনীকে দেখে তার রূপমুগ্ধ এবং মুগ্ধতাবশে চন্দ্রশেখর কর্তৃক শৈবলিনীকে বিবাহ করে গৃহে আনয়ন। নিজেও সুদর্শন পুরুষ, তদুপরি নিষ্ঠাপরায়ণ, চরিত্রবান। কিন্তু সহজ দাম্পত্য জীবনযাপন চন্দ্রশেখরের ভাগ্যে ঘটে উঠল না। এর জন্য দায়ী কিছুটা তার অদৃষ্ট-লিখন এবং কিছুটা তার নিজের চরিত্র। এমন এক নারীকে তার স্ত্রী রূপ গ্রহণ, যে অন্যপূর্বা। অন্যপূর্বা শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের পক্ষে আপন করে নেওয়া হয়তো সম্ভব হত, যদি সে দাম্পত্য জীবনের কর্তব্যপালনে চ্যুত না হত। প্রতিনিয়ত জ্ঞানচর্চা তাকে নবযৌবনা স্ত্রীর প্রতি যথাকর্তব্য পালন করতে দেয়নি, দূরে সরিয়ে দিয়েছে ক্রমশ। আর সম্ভবত কিছুটা এই কারণেই স্বামীর সংসারে শৈবলিনীর মন উঠল না। শৈবলিনী ও প্রতাপ ছিল একই বৃন্তের দুটি পুষ্প। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে দিয়েই বলিয়েছেন যে বিকশিত পুষ্পদুটির একটিকে চন্দ্রশেখর বৃন্তচ্যুত করেছে। ফলে দাম্পত্য জীবনে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের কোনো হৃদয়ের সম্পর্ক গড়েই ওঠেনি। এই সব মিলিয়ে নববিকশিত যৌবনময়ী শৈবলিনীর নিকট এই নিষ্প্রেম পরিবেশ নিতান্ত দুঃসহ বলে মনে হবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত, প্রতাপকে কেন্দ্র করে বাল্য কৈশোরের প্রণয়স্মৃতি তার হৃদয়ে নিরন্তর বেদনার সঞ্চার করে চলেছে। সেই সঙ্গে স্বামীগৃহের নিষ্প্রেম পরিবেশ শৈবলিনীকে গৃহ বিরাগিনী ও প্রতাপ অনুরাগিনী করে তুলেছে।

চন্দ্রশেখর আত্মাসমালোচক পুরুষ—রূপসী তরুণী পত্নীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা ঘটছে, এ বোধ তার ছিল। চন্দ্রশেখরের হৃদয়দ্বন্দ্বের প্রতি বঙ্কিম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চন্দ্রশেখরের মনে ধারণা গড়ে উঠেছিল—

Scanned by CamScanner

"আমার যে বয়স তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। .....আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নবযুবতীর কি সুখ ? আমি নিতান্ত আত্মপরায়ণ, সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব ? এই ক্লেশ সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমনী মুখপদ্ম কি এজন্মের সারভূত করিব ? ছি ছি, তাহা পারিব না।"

এর মধ্যে দিয়ে চন্দ্রশেখরের হৃদয়দ্বন্দ্বের এবং অনুতাপ সিঞ্চিত আত্মগ্লানির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের গভীর ভালোবাসাও ছিল শৈবলিনীর প্রতি। ফস্টর কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পূর্বে শৈবলিনী দীর্ঘ আট বছর স্বামীগৃহে অতিবাহিত করে। এই দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুধু কর্তব্যচেতনাকে ছদ্ম আবরণে চন্দ্রশেখরের হৃদয়োপলব্ধি সীমাবদ্ধ থেকেছে—আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হবে। কিন্তু শৈবলিনী কখন যে কিভাবে তার মনের সংগোপন কোণে একটা স্থান দখল করেছে, চন্দ্রশেখর তার উপলব্ধি করতে পারেনি, জানতেও পারেনি। যেদিন জানতে পেরেছে সেদিন শৈবলিনী তার গৃহের অবরোধ কাটিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রী। নবাব মীরকাশেমের আহ্বানে চন্দ্রশেখরের মুর্শিদাবাদ যাত্রা। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কালে চন্দ্রশেখরের মনে হয়েছে—

"এ বয়সে আমাকে গুরতর মোহ বন্ধে পড়িতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলই ব্রহ্ম। যদি তা-ই হয়, তবে কাহারো প্রতি প্রেমাধিক্য, কাহারো প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন ? সকলই তো সেই সচ্চিদানন্দ। আমার যে তল্পি লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাইতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন ? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন ? এই মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না, যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।"

চন্দ্রশেখরের হৃদয় প্রদেশের এরূপ উৎকণ্ঠা স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমাকর্ষণের নির্ভুল পরিচয় বহন করে। এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই শুধু ছিল না, এ ভালোবাসা তরঙ্গোদ্বেল নয়,—প্রশান্ত স্মিত স্নেহের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে চকিত আত্মোন্মোচন দেখা যেত এর।

চন্দ্রশেখরের প্রেমিক সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে ফস্টর কর্তৃক শৈবলিনী অপহৃতা হবার পরবর্তী পর্বে। বেদনার কঠিন কঠোর আঘাতে তার হৃদয়স্থিত প্রেমিক সত্তার, সংগোপনতার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। অনুরূপ পরিবেশে তার হৃদয় বেদনা অসহনীয়, কিন্তু তার বহিরঙ্গ প্রকাশ শান্ত, সংযত, শোভন—এতদিন পর্যন্ত যে স্থৈর্যশীল চন্দ্রশেখরের পরিচয় পেয়েছি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতকালের সযত্নে সংগৃহীত গ্রন্থগুলি অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করেছে চন্দ্রশেখর এবং গ্রন্থ সব ভস্মীভূত হয়ে গেলে তার গৃহত্যাগ। গৃহত্যাগের কারণ—গৃহে গৃহিণীর অভাব, একটা শূন্যতা ছেয়ে ফেলেছে চারদিক—চন্দ্রশেখরের মনও শূন্য, গৃহও শূন্য। আর গ্রন্থসমূহকে দগ্ধ করা হল। কারণ চন্দ্রশেখরের ধারণা এই সমস্ত গ্রন্থরাশি-ই তার সঙ্গে শৈবলিনীর দূরতর ব্যবধান রচিত হবার কারণ। শৈবলিণী আজ

Scanned by CamScanner

নেই, আর গ্রন্থ সংগ্রহে কাজ কি ? গ্রন্থ দগ্ধ কার্য চন্দ্রশেখরের দাম্পত্যজীবনে কর্তব্যচ্যুতির একটা প্রলেপন, একটা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র গৃহত্যাগী চন্দ্রশেখরকে আংশিকভাবে লোকহিতব্রতী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের চরিত্র পর্যালোচনায় তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয়। রমানন্দ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে চন্দ্রশেখরের স্নেহকোমল ভাবগম্ভীর চরিত্রের উপর সমাজনীতির একটা আবরণ নেমে এসেছে। তা ছাড়া স্বামীজী সংসর্গে এসে তার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশও যেন কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এখান থেকে চন্দ্রশেখরের কর্মধারার নিয়ামক মহাপুরুষ রমানন্দ। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে অনুসরণ করেছে, তার অর্ধমূর্ছিত দেহ পর্বতগুহায় রেখে এসেছে। উন্মাদগ্রস্থ হলে শৈবলিনীর শুশ্রূষা করেছে, তাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে বেদগ্রামে, যৌগিক প্রক্রিয়ায় তার চিকিৎসা করেছে। কিন্তু এ সবকিছুই গুরু রমানন্দের নির্দেশে। এর মধ্যে ক্রিয়াশীল বা কর্ম-উদ্দীপনাময় চন্দ্রশেখরের চরিত্রকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক ; তা ব্যর্থই প্রতিপন্ন হবে। তবে আভাসে-ইঙ্গিতে এটুকু বোঝা যায় বা উপলব্ধি করা সম্ভব ; তা হল—গৃহত্যাগিনী শৈবলিনীকে পুর্ণবার গ্রহণের আন্তরিক ব্যাকুলতা। চন্দ্রশেখর পাপকে ঘৃণা করেছে, কিন্তু "পাপীয়সী" শৈবলিনীর প্রতি কোনো ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করেনি। তাছাড়া, শৈবলিনীর গৃহত্যাগ ও দুর্দৈব বরণের জন্য যে তার নিজেরও কিছু দায় ছিল, সেই দায়িত্বকে অস্বীকার করেনি চন্দ্রশেখর। সে যে শৈবলিনীকে তার স্ব-গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজের স্নেহযুক্ত ভালোবাসার পক্ষপুটে তার নির্ভয় স্থান করে দিয়েছে,—এতে হৃদয়ের ঔদার্য্য ও ক্ষমার মহত্বে মহান চন্দ্রশেখর। ক্ষমা ও তিতিক্ষার প্রকাশে চন্দ্রশেখর অর্জন করেছে আদর্শ পৌরুষের গৌরব—স্ত্রীর স্খলন পতনজনিত ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মধ্যে রয়েছে স্বামীত্বের গৌরব। দাম্পত্যধর্মকে এইভাবে কল্যাণের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—এটাই চন্দ্রশেখর চরিত্রের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'চন্দ্রশেখর' চরিত্রের পরিণতি প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

> "বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'চন্দ্রশেখর', তাহার কারণ চন্দ্রশেখরকে তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা সফল হয় নাই, প্রাণের প্রচণ্ড স্রোতে শিলাস্তূপ ভাসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর চরিত্রের সাত্ত্বিক কঠোরতা তিনি মানবীয় হৃদয়বৃত্তির দ্বারা শোধন করিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৃপার পাত্র হইয়াছেন। শৈবালিনী পাপীয়সী—অন্যপূর্বা ও কুলত্যাগিনী। সেই পত্নীকে এইরূপ শুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত করিয়া সে যখন ঘরে তুলিয়া লইতেছে তাহাতে তাহার অপার করুণা ও স্নেহ অপেক্ষা দুর্বলতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।"

কিন্তু শুধুমাত্র হৃদয়ের দুর্বলতাবশে, স্ত্রীর দেহসৌন্দর্যের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলেই শৈবলিনী চন্দ্রশেখর কর্তৃক গৃহীতা, এমন ধারণা সর্বাংশে বোধহয় সত্য নয়। চিত্তের করুণাবশে স্ত্রীর অপরাধ মার্জনা করেছে চন্দ্রশেখর। এই করুণাদৃষ্টি ও ক্ষমাসুন্দর মহিমার

Scanned by CamScanner

অধিকারী না হলে কিছুতেই শৈবলিনীকে সে স্বাধিকারে স্বগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। হয়ত একদা শৈবলিনীর প্রতি ছিল তার মোহসঞ্জাত প্রেম ; কিন্তু পরিনামে তা-ই পরিণত হয়েছে হৃদয়-সঞ্জাত প্রেমভাবে। চন্দ্রশেখর চরিত্রের সঙ্গে বিষয়টি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতাপ চরিত্র

'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থে শৈবলিনীর পরেই প্রধান চরিত্র প্রতাপ। তাকে রোমান্সের প্রতিনায়ক হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে। কর্মোদ্দীপনায় এবং চরিত্রদীপ্তিতে তার আকর্ষণ নায়িকা শৈবলিনীর পরেই। প্রতাপ বীর, সাহসী এবং কৌশলী পুরুষ চরিত্র। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্মে ক্ষিপ্রতা, আত্মবিসর্জনে নির্ভয়তা তাকে রোমান্সের নায়কের মর্যাদা দিয়েছে। পাঠক হৃদয়ের আকর্ষণ ও কৌতুহল প্রতাপকে কেন্দ্র করে অশেষ ধারায় বিকশিত। ভৃত্য রামচরণকে সঙ্গে নিয়ে চাতুর্য ও সাহসিকতাকে পাথেয় করে সশস্ত্র ইংরেজের নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেছে, চাতুর্যময়ী শৈবলিনীর সাহায্যের সুযোগে দুর্ধর্ষ ইংরেজদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে সুদূর মুঙ্গের পর্যন্ত যেভাবে নিজের অনুচর লাঠিয়ালদের দ্বারা বেষ্টনী রচনায় প্রতিপক্ষকে চিন্তিত করে তুলেছে এবং তারপর পরিণতিতে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অসম সাহসিকতায় শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বীরোচিত মৃত্যুবরণ। এই সমুদয় প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে তার প্রাণদীপ্ত, কর্মচঞ্চল চরিত্র আমাদের ঔৎসুক্য, কৌতুহল ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

কোনো কোনো সমালোচকের অভিমত, প্রতাপের হৃদয়বৃত্তি বণরাগ বৈচিত্র্যবিহীন। বাইরের দিক থেকে যে প্রতাপ অশেষ কর্ম উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের দিক থেকে তাতেই সক্রিয়তার অভাবের বিবর্ণতা দৃশ্যমান। শৈবলিনীর সঙ্গে তার আবাল্য-আকৈশোর প্রণয়। কিন্তু যখন উভয়ই বুঝতে পেরেছে সামাজিক আত্মীয়তা সূত্র আছে বলে উভয়ের প্রেম মিলনে সার্থক হবে না, তখন উভয়ই আত্মবিসর্জনের সংকল্প করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রতাপ ডুবেছে, শৈবলিনী ডুবতে পারেনি। অবশ্য নৌযাত্রী চন্দ্রশেখর নিমজ্জমান দশা থেকে তার উদ্ধার সাধন করেছে। এই অংশটিতে প্রতাপ চরিত্রের স্থির সংকল্পবদ্ধ চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সংকল্প একবার গ্রহণ করলে নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়ে তার জন্য যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু শৈবলিনীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন সম্পর্ক বলে প্রতাপ নিজেকে সামাজিক-অনুশাসনের সংযম-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে ; নিজেও রূপসীকে বিবাহ করেছে। অবশ্য রূপসীর সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে, লেখক সে প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত দেননি। তবে অনুমান করা যায়, শৈবালিনী প্রতাপের হৃদয়দেশে যেভাবে অধিকার বিস্তার করেছিল, তাতে রূপরীসর স্থান প্রতাপের বহিরঙ্গ গৃহপরিবেশে যতখানি, অন্তরঙ্গ হৃদয় পরিবেশে ততখানি নয়। প্রতাপ যে শৈবলিনীকে তখনো বিস্মৃত হতে পারেনি, কোনদিনও বিস্মৃত হতে পারেনি, তাতে সংশয় নেই। তবুও শৈবলিনী ও নিজের বিবাহোত্তর জীবনে প্রতাপ চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, প্রতাপ সামাজিক অনুশাসন ও সমাজের বিধিবিধান মেনে চলার পক্ষপাতী। লোকায়ত পাপ-পুন্যবোধও তার মধ্যে বর্তমান। কঠিন-কঠোর আত্মশাসনের মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়দ্বন্দ্ব সূচিত। প্রতাপের নিজের উক্তিতেই রয়েছে—

Scanned by CamScanner

"ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয় তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম; তোমার বিষের ভয় আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিত দিয়েছেন বিবাহোত্তর জীবনেও প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে দু'-একবার সাক্ষাৎ ঘটেছে। বাল্য-কৌশোরের প্রণয়স্মৃতি যে মাঝে মাঝে প্রতাপের কঠিন কঠোর সংযম শাসনের সীমায়তন অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করত না এমন নয়। একদিকে সামাজিক বিধিবিধান ও পাপপুণ্যবোধের সংযম সাধন ; অন্যদিকে বাল্য-কৌশোরের প্রণয়স্মৃতি—উভয়ের দ্বন্দ্বে প্রতাপ নিয়ত সংগ্রামী। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের শোণিত উৎসারণের মধ্য দিয়েই প্রতাপ চরিত্রের সার্থক প্রাণ প্রতিষ্ঠা। অবশ্য লেখক তার এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি, আভাস-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় তার অল্পস্বল্প প্রকাশ ঘটেছে মাত্র। তাতেই চরিত্রটি আরো বেশি কৌতুহলোদ্দীপক ও মহিমাময় হয়ে উঠেছে।

প্রতাপের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত প্রকাশ সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেখিয়েছেন বঙ্কিম। উন্মাদপ্রায় শৈবলিনী ইংরেজের নৌকায় বন্দি প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তারপরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশলে প্রতাপ মুক্তিলাভ করেছে। উভয়ই গঙ্গাবক্ষে সন্তরণরত সেই পরিবেশে। সেদিন আকাশে চাঁদের আলো, নদীর বুকে ঢেউয়ে আর জ্যোৎস্নায় এক মোহময় সৌন্দর্যের খেলা। মাঝে এমন এক-একটি দিন আসে যেদিন মনের তারে আঘাত লেগে সুপ্ত তন্ত্রীগুলি একসঙ্গে বেজে ওঠে। এহেন অসাধারণ দিনগুলি মানুষকে আকস্মিকভাবে প্রত্যহের অতীত লোকে নিয়ে যায়। তখন মনের উপর তলাকার চেতনার স্তরটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, গহনচিত্তচারী ভাবানুভূতি সব প্রাণচাঞ্চল্যে মেতে ওঠে। প্রতাপের জীবনের এই দিনটিও সেইরূপ। প্রাণের উপরকার সংযমের কঠিন আবরণটি যেন মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল—প্রতাপের বন্দি চিত্ত মুক্তি পেল। সে শৈবলিনীকে বহুকাল পরে আবার সেই পরিচিত 'শৈ' নামে ডাকল। এই যে 'শৈ' সম্বোধন—এ প্রতাপের হৃদয়গ্রন্থের এক বিরাট পরিচয়। গভীর ভালোবাসা, কঠিন সংযম আর প্রচণ্ড সংগ্রামের আরেক নাম প্রতাপ। প্রতাপের উচ্চারিত এই 'শৈ' ডাকটির রন্ধ্রপথে তার একান্ত গোপনে লালিত প্রেমানুভবের শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। সংযমের বাঁধ বুঝি টুটে যাবে এবার। কিন্তু প্রতাপ রায়ের হৃদয়বৃত্তির মুহূর্তের, তার আত্মবিস্মৃতি ক্ষণিকের। মুহূর্ত পরেই প্রতাপ সচেতনতা ফিরে পেল, সহসা মরে যাওয়া সংযমের আবরণটি হৃদয়ের উপর টেনে দিল। সেই গঙ্গাবক্ষে আবেশ মূর্ছিতা শৈবলিনীকে দিয়ে সে শপথ করিয়ে নিল যে, তার স্মৃতিকে বিস্মরণের অতলে ডুবিয়ে দিতে হবে। এখানেই প্রেমিক প্রতাপের সত্যকার মানসিক মৃত্যু—মৃত্যু প্রেমব্যাকুলতাময়ী শৈবলিনীর।

তারপর প্রতাপকে আমরা দেখতে পাই অন্যতর পরিবেশে। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে নবাব পক্ষের একজন প্রধান সাহায্যকারী রূপে পরিগণিত। মুর্শিদাবাদ থেকে সুদূর মুঙ্গের পর্যন্ত নবাবপক্ষের হয়ে লাঠিয়াল সংগ্রহ করে প্রতিপক্ষকে ভীত করে তুলেছে প্রতাপ। চন্দ্রশেখরের কাছে প্রতাপ কৃতজ্ঞ ; অন্যদিকে, শৈবলিনীকেও সে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে, তার কল্যাণই প্রতাপের একমাত্র প্রত্যাশা। সর্বোপরি, শৈবলিনী বিহীন জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়—এই সমস্ত হৃদয়ভাব মিশ্রিত হয়ে প্রতাপকে বহিরঙ্গ সংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রেরণা দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রতাপ যে আত্মত্যাগ করতে চলেছে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে, তাতে তার জীবনসংগ্রাম বিমুখ পলায়নী মনোভাবের পরিচয় মেলে। কিন্তু প্রতাপের এই আত্মোৎসর্জন তার চরিত্রাভিব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হয়। বাইরের কর্মোম্মাদনার মধ্যে দিয়ে যতই প্রতাপ আপন জীবন-মন-পরিবেশ বিস্মরণের প্রয়াস পান না কেন, অন্তরের দিক থেকে যে অবক্ষয় দীর্ঘদিন ধরে সূচিত হয়ে চলেছে, তাতে সংশয় নেই। এই অবক্ষয়ের এরূপ পরিণতিই স্বাভাবিক। তাছাড়া তার আত্মোৎসর্জনের একটি প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুদ্ধযাত্রী প্রতাপের শৈবলিনীর সাক্ষাৎকার ঘটেছে। শৈবলিনী তাকে বলেছে—

> "যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না! এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

এমতাবস্থায় প্রতাপ বেঁচে থাকা নিরর্থক মনে করেছে। এটা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। প্রেমের এক অভিনব উপলব্ধি তার হৃদয়ে উন্মেষিত হয়েছে। শৈবলিনী রোগমুক্ত হয়েছে, কিন্তু যোগশক্তি আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রণয়বৃত্তি নিঃশেষিত হয়নি। প্রতাপের জীবিত থাকা পর্যন্ত শৈবলিনীর কল্যাণ নেই। কিন্তু তার কল্যাণই যে প্রতাপের একান্ত অভিপ্রায়। সেই কল্যাণ সূচিত হবার জন্য, তাকে যথার্থ সুখী করবার জন্য যদি আত্মোৎসর্জন করতে হয়, তাতেও সে মনের দিক থেকে প্রস্তুত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যুবরণের মধ্যে দিয়ে প্রতাপ এই মানস প্রস্তুতিরই পরিচয় দিয়েছে। মৃত্যু পথযাত্রী প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে বলেছে—

> "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরোপকারী, তাহাদিগের সুখের কন্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম।.....আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত কখনো না কখনো বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। এতএব আমি চলিলাম।.....এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালোবাসা বুঝিবে।"

এর পরেই প্রতাপের সেই হৃদয়বেদনা মথিত যন্ত্রণাময় উক্তি, যা আমাদেরও অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায়—

> "আমার ভালোবাসার নাম আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

প্রতাপের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর মূল উদ্দেশ্য এখানে প্রতিপাদন করেছেন। তা হল এই যে, প্রকৃত ভালোবাসার আর এক নামই চরম আত্মত্যাগ। শৈবলিনীর প্রতি গভীর ভালোবাসাই প্রতাপের আত্মবিসর্জনের পরিবেশ রচনা করেছে। আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রতাপ শৈবলিনীকে সুখী করবার, তার কল্যাণের জন্য শেষ চেষ্টা করেছে। প্রতাপের সংযম শাসিত হৃদয়বৃত্তি, আদর্শলোকের প্রেমচেতনা যেমন আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তার চরিত্রটিকে মহিমাময় করে তোলে, তেমনই প্রেমের বেদীমূলে চিরবিরহী প্রতাপের আত্মোৎসর্জন আকর্ষণ করে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ও সমবেদনা।

Scanned by CamScanner